Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501087 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Science and Music
সংগীত ও বিজ্ঞান

Dr. Koushik Roy
Writer and Researcher
Instrumental Music Department
Rabindra Bharati University

Received on: 15th May 2026
Accepted on: 28th May 2026

Abstract:
The discussed article analyses the deep and inseparable relationship between music and science. Music is not merely a fine art; rather, it is rooted in acoustics and mathematical precision. The essay explains the importance of 'Nada' or sound as the origin of all audio, highlighting three dimensions of acoustics—articulatory, acoustic (wave-based), and auditory perspectives. In accordance with the laws of physics, the nature of sound waves, reflection, refraction, and the necessity of a medium for propagation are described in detail. Furthermore, a physiological explanation is provided regarding the structure of the human ear and how we perceive and process sound waves within the brain.

To demonstrate the mathematical side of music, the application of Pythagorean theory, the Fibonacci sequence, and the Golden Ratio are highlighted, all of which can be observed in the works of great maestros like Mozart. Finally, through the mathematical division of rhythm, tempo, and beats (tala, laya, and matra), it is proven that an extraordinary contribution of science lies behind every melody and rhythm. In essence, it is impossible to imagine the existence of music without science.

Key Words:
Music, Science, Application of Science in Music, Inseparability.

মূল প্রবন্ধ

চৌষট্টি কলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যার মধ্যে সংগীত হলো সর্বোৎকৃষ্ট ক্রিয়াশীল শিল্প। শুধুমাত্র নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষার জোরে সংগীত ভাষা-বর্ণ-ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে সকলের আপনার জন হয়ে উঠতে পারে। সেই কারণেই পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের সুর তথা ছন্দ, অপর যে কোনো প্রান্তের মানুষের মনকে সহজেই রঞ্জিত করতে পারে। মানবচিত্তকে শুধু রঞ্জিত করতেই নয় বরং মানুষের মনকে জাগ্রত বা নিয়ন্ত্রণ করতেও সংগীতের ভূমিকা অপরিসীম। তাই সংগীত শুধুমাত্র চারুকলাস্থিত গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে তথা বিজ্ঞান

© Santiniketan Sahityapath

বিষয়ক ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবদান রাখে। বিজ্ঞান ছাড়া সংগীতের অস্তিত্বকে কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী স্যার এলবার্ট আইনস্টাইনের ভাষায়, "Music is pleasing, Science is interesting but Music without Science is nothin."

সংগীতের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ব্রহ্মস্বরূপ "নাদ" থেকে এর জন্ম। নাদ বা ধ্বনি অথবা শব্দের ভূমিকা সংগীতে অপরিহার্য। ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হলো ধ্বনি। যেমন, কলা শব্দটি ভাঙলে (ক+অ+ল+আ) ক, অ, ল, আ এই ধ্বনিগুলি পাওয়া যায়। কোনো ভাষার উচ্চারিত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে যে উপাদানসমূহ পাওয়া যায় সেগুলিকে পৃথকভাবে ধ্বনি বলে। ধ্বনির সঙ্গো সাধারণত অর্থের সংশ্লিষ্টতা থাকে না, ধ্বনি তৈরি হয় বাক্-যন্ত্রের সাহায্যে। ধ্বনি নিয়ে চর্চা করতে গেলে মূলত দুটি শাখা দেখা যায়। একটি ভাষাতাত্ত্বিক যেটি ধ্বনিতত্ত্ব এবং অপরটি হলো বিজ্ঞানভিত্তিক, ধ্বনিবিজ্ঞান। ধ্বনিতত্ত্বের সঙ্গো ধ্বনিবিজ্ঞানের পার্থক্য হলো এই যে, ভাষাবিজ্ঞানের এই শাখায় ধ্বনির ভৌত তরঙ্গাধর্মী প্রকৃতি, এর উৎপাদন, শ্রবণ ও অনুধাবন নিয়ে গবেষণা করা হয়, কিন্তু ধ্বনিতত্ত্বের মতো বিভিন্ন ধ্বনি-একক, তাদের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য, ধ্বনির পরিবর্তন ও ধ্বনি-ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করা হয় না। ধ্বনিতত্ত্ব, গ্রীক শব্দ 'ফোনেটিক্স' থেকে যার জন্ম সেটি ভাষাতত্ত্বের একটি শাখা যার মধ্যে রয়েছে মানুষের কথার অন্তর্গত শব্দের গবেষণা, অথবা ভাষার ক্ষেত্রে চিহ্নের ব্যবহার-বা চিহ্নের সমতুল্য দিক।

ধ্বনিবিজ্ঞানের তিনটি প্রধান শাখা:

উচ্চারণগত ধ্বনিবিজ্ঞান — এই শাখায় ধ্বনি উৎপাদনে ঠোঁট, জিহ্বা, কণ্ঠ ও অন্যান্য বাক্-যন্ত্রের অবস্থান ও সঞ্চালন আলোচনা করা হয়।

তরঙ্গাগত ধ্বনিবিজ্ঞান — এই শাখায় ধ্বনির তরঙ্গাগত বৈশিষ্ট্য এবং এই তরঙ্গাগুলি কীভাবে অন্তঃকর্ণে পৌঁছায় তার আলোচনা।

এবং

শ্রুতিগত ধ্বনিবিজ্ঞান — এই শাখায় বক্তব্য অনুধাবন (speech perception), অর্থাৎ মস্তিষ্ক কীভাবে ধ্বনিগত ইনপুট প্রক্রিয়া করে তার আলোচনা।

সংগীতের ক্ষেত্রে মূলত ধ্বনিবিজ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনাই প্রধান, তাই আলোচ্য নিবন্ধে এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হলো। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শব্দ তরঙ্গা, কর্ণের গঠন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। পদার্থবিজ্ঞানে শব্দ হলো এক ধরনের কম্পন যা গ্যাস, তরল বা কঠিন মাধ্যমের সাহায্যে শব্দ তরঙ্গা হিসাবে সঞ্চালিত হয়।[১] যেসকল শব্দের কম্পাঙ্ক ২০Hz থেকে ২০kHz কম্পাঙ্ক সীমার মধ্যে অবস্থিত, কেবল সেই শব্দই মানুষের মধ্যে শ্রবণ অনুভূতি প্রকাশ করে। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ও বায়ু মাধ্যমে এই শব্দের তরঙ্গাদৈর্ঘ্য ১৭ মিটার (৫৬ ফু) থেকে ১.৭ সেন্টিমিটার (০.৬৭ ইঞ্চি)। ২০kHz উপরের শব্দ তরঙ্গাগুলি আল্ট্রাসাউন্ড বা শ্রবণাতীত শব্দ হিসাবে পরিচিত এবং এগুলো মানুষের কাছে শ্রবণীয় নয়। ২০Hz এর নিচের শব্দ তরঙ্গাগুলি ইনফ্রাসাউন্ড বা অবশ্রাব্য শব্দ হিসাবে পরিচিত। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর শ্রবণসীমা বিভিন্ন হয়ে থাকে। শব্দবিজ্ঞান হলো আন্তঃশৃঙ্খলা বিজ্ঞান যা কম্পন, শব্দ, শ্রবণাতীত শব্দ এবং অবশ্রাব্য শব্দ-সহ গ্যাস, তরল এবং কঠিনের মধ্যে যান্ত্রিক তরঙ্গা অধ্যয়নের বিষয়ে আলোচনা করে।

শব্দ বায়ু, তরল এবং কঠিনের মধ্য দিয়ে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গা হিসাবে এবং কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে আড় তরঙ্গা হিসাবেও প্রসারিত হতে পারে। শব্দ তরঙ্গাগুলি একটি স্টিরিও স্পিকারের স্পন্দিত ডায়াফ্রামের মতো শব্দ উৎস দ্বারা উৎপন্ন হয়। শব্দ উৎস আশেপাশের মাধ্যমে কম্পন সৃষ্টি করে। উৎসটি মাধ্যমে কম্পন সৃষ্টি করতে থাকে এবং কম্পনগুলি উৎস থেকে শব্দের গতিতে চারপাশে বিস্তারিত হয়ে থাকে, ফলে শব্দ তরঙ্গা তৈরি হয়। উৎস থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে চাপ, বেগ এবং মাধ্যমের সরণ সময়ের সঙ্গো পরিবর্তিত হয়। কোনো মুহূর্তে চাপ, বেগ এবং সরণ স্থানের সঙ্গো ভিন্ন হতে পারে। লক্ষণীয় যে, মাধ্যমের কণাগুলি শব্দ তরঙ্গোর সঙ্গো স্থায়ীভাবে সরে যায় না। এটি কঠিন, তরল এবং গ্যাস সকল মাধ্যমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (গ্যাস বা তরল পদার্থের কণাগুলি স্পন্দন

© Santiniketan Sahityapath

পরিবহন করে, কিন্তু সময়ের সঙ্গো সঙ্গো কণার গড় অবস্থান পরিবর্তন হয় না)। প্রসারের সময় মাধ্যমের মধ্যে তরঙ্গাগুলি প্রতিফলিত, প্রতিসরিত এবং শিথিলতাপ্রাপ্ত হতে পারে।

শব্দ সঞ্চারণ সাধারণত তিনটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়:
মাধ্যমের ঘনত্ব এবং চাপের মধ্যে একটি জটিল সম্পর্কের দ্বারা: তাপমাত্রা দ্বারা প্রভাবিত এই সম্পর্কটি মাধ্যমের মধ্যে শব্দের গতি নির্ধারণ করে।

মাধ্যমের নিজের গতি: যদি মাধ্যমটি চলমান থাকে তবে এই চলনের দিকের উপর নির্ভর করে শব্দ তরঙ্গোর পরম গতি বাড়াতে বা কমতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি শব্দ এবং বায়ু একই দিকে অগ্রসর হয় তবে বাতাসের বেগ এর মধ্য দিয়ে চলমান শব্দের বেগকে বাড়িয়ে তুলবে। আবার, শব্দ এবং বায়ু যদি বিপরীত দিকে চলতে থাকে তবে বাতাসের গতিবেগের কারণে শব্দ তরঙ্গোর বেগ হ্রাস পাবে।

মাধ্যমের সান্দ্রতা: মাধ্যমের সান্দ্রতা শব্দের তীক্ষ্ণতা হ্রাসের হার নির্ধারণ করে। বায়ু বা জল হিসাবে অনেক মাধ্যমের সান্দ্রতা কারণে তীক্ষ্ণতার হ্রাস নগণ্য।

শব্দ যখন এমন কোনো মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলাচল করে যার ভৌত বৈশিষ্ট্য ধ্রুবক নয়, তখন এটি প্রতিসরিত হতে পারে (হয় অভিসারিত বা অপসারিত)। যান্ত্রিক কম্পন যা শব্দ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় তা সকল ধরণের পদার্থের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতে পারে, যেমন গ্যাস, তরল, কঠিন এবং প্লাজমা। যা শব্দকে ধারণ করে তাকে বলা হয় মাধ্যম। শব্দ শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে পারে না। শব্দ বিস্তারের জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজনের কারণ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে শব্দ বিস্তারের জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়।

১. তরঙ্গা সৃষ্টির জন্য কোনো বস্তুর কম্পনের প্রয়োজন, শব্দ সৃষ্টির জন্য একইভাবে বস্তুর কম্পনের প্রয়োজন।
২. তরঙ্গা যেমন মাধ্যম অবলম্বন করে চলে, শব্দও তেমনি মাধ্যম ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে না।
৩. তরঙ্গা যখন বেগ আছে; শব্দ তেমনি বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন গতিবেগে প্রবাহিত হয়। এই গতিবেগ মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতা ও ঘনত্বের উপর নির্ভর করে।
৪. তরঙ্গা বিস্তারের সময় যেমন মাধ্যমের স্থায়ী স্থানচ্যুতি ঘটে না, তেমনি শব্দ বিস্তারের সময়ও মাধ্যমের স্থানীয় স্থানচ্যুতি ঘটে না।
৫. তরঙ্গো দেওয়ার প্রতিফলন ও প্রতিসরণ হয় শব্দের ক্ষেত্রেও তেমনি প্রতিফলন ও প্রতিসরণ হয়ে থাকে।
৬. তরঙ্গা বিস্তারের জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়, শব্দ বিস্তারের ক্ষেত্রেও সময়ের প্রয়োজন হয়।
এক কথায় বলা যায়, শব্দ বিস্তারের জন্য তরঙ্গা বিস্তারের প্রয়োজন হয়। তরঙ্গা বিস্তারের জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। ঠিক সেই কারণে শব্দ বিস্তারের জন্যও জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়।

তরঙ্গা দুই প্রকারের হয়[২]। যথা,
১. অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গা এবং
২. তির্যক তরঙ্গা।

অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গা
কোন সমসত্ত্ব স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের কণাগুলির সমষ্টিগত কম্পনের ফলে, মাধ্যমে যে তরঙ্গোর সৃষ্টি হয় এবং তরঙ্গা বিস্তারের সময় মাধ্যমের কণাগুলি যদি তরঙ্গোর গতির অভিমুখের সঙ্গো সমান্তরালভাবে কম্পিত হয়, তবে ওই তরঙ্গাকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গা বলে।
অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গোর উদাহরণ

 © Santiniketan Sahityapath

এটি লম্বা জ্বালানো স্প্রিং-এর নিচের প্রান্ত টেনে ছেড়ে দিলে দেখা যাবে, স্প্রিং-এর প্রত্যেক অংশ ওঠানামা করে স্প্রিং-এর বিভিন্ন অংশে সংকোচন-প্রসারণের সৃষ্টি করছে। এই সংকোচন-প্রসারণ স্প্রিং-এর দৈর্ঘ্য বরাবর অগ্রসর হয়ে তরঙ্গা সৃষ্টি করে। এইভাবেই স্প্রিং-এ যে তরঙ্গোর সৃষ্টি হয় সেই তরঙ্গা হলো অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গা। বাতাসের মধ্য দিয়ে শব্দ সঞ্চালনের সময় স্থিতিস্থাপক বায়ুস্তরগুলির পর্যায়ক্রমে সংকোচন প্রসারণ ঘটে। ফলে শব্দ অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গোর আকারে বিস্তার লাভ করে এবং আমাদের কানের পর্দায় এসে পৌঁছায়, ফলে আমরা শুনতে পাই। তাই শব্দ তরঙ্গাকে এক রকমের অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গা বলা হয়।

তির্যক তরঙ্গা

কোনো স্থিতিস্থাপক মাধ্যমে তরঙ্গা বিস্তারের সময় মাধ্যমের কণাগুলি যদি তরঙ্গোর গতির অভিমুখে সঙ্গো লম্বভাবে কম্পিত হয়, তবে ওই তরঙ্গাকে তির্যক তরঙ্গা বলে। পুকুরের জলে ঢিল ফেললে জল আন্দোলিত হয় এবং তরঙ্গা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে জলে তরঙ্গোর সৃষ্টি হলেও জলকণাগুলি শুধু একই জায়গায় থেকে ওঠা নামা করতে থাকে এবং পাশের কনাগুলিতে আন্দোলন সঞ্চারিত করে — তরঙ্গোর সঙ্গো কিন্তু কণাগুলি এগিয়ে যায় না। কণাগুলি তরঙ্গোর অভিমুখে সঙ্গো তীর্যকভাবে ওঠানামা করে। তাই জলের মধ্যে উৎপন্ন এই তরঙ্গা হলো তির্যক তরঙ্গা।

তির্যক তরঙ্গোর উদাহরণ, আলোক তরঙ্গা, বেতার তরঙ্গা, তাপ তরঙ্গা প্রভৃতি তরঙ্গা তির্যক তরঙ্গোর উদাহরণ।

শব্দ তরঙ্গোর প্রকৃতি বা ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য

শব্দ একরকমের শক্তি, যা উৎসের কম্পনের ফলে উৎপন্ন হয়ে তরঙ্গোর আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কোন সুরশলাকাকে রাবারের হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে ওই সুরশলাকাতে যে কম্পনের সৃষ্টি হয়, তা থেকে উৎপন্ন শব্দ জড় মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গোর আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ওই তরঙ্গাগুলি শ্রোতার কানের পর্দায় আঘাত করলে শ্রোতা শব্দ শুনতে পায়।

শব্দ তরঙ্গোর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচে শব্দ তরঙ্গোর বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম বা প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

১. কোন বস্তুর কম্পন ব্যতীত শব্দ তরঙ্গোর সৃষ্টি হয় না।

২. শব্দ তরঙ্গোর ক্ষেত্রে প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ দুইই ঘটে।

৩. শব্দ তরঙ্গোর বেগ আছে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে গতিবেগের ভিন্নতা দেখা যায়।

৪. শব্দতরঙ্গা মাধ্যম অবলম্বন করে চলে। কোন মাধ্যম ছাড়া শব্দ তরঙ্গা বিস্তার লাভ করতে পারে না।

৫. শব্দতরঙ্গা বিস্তারের জন্য মাধ্যমের স্থানচ্যুতি ঘটে না।

যদিও শব্দের সঞ্চালন সম্পর্কিত অনেকগুলি জটিলতা রয়েছে, শ্রবণের ক্ষেত্রে (যেমন কান), শব্দ সহজেই দুটি উপাদান চাপ এবং সময়ে বিভাজ্য হয়। এই মৌলিক উপাদান দুটি সমস্ত শব্দ তরঙ্গোর ভিত্তি তৈরি করে। এই উপাদান দুটি শ্রাব্য সকল শব্দকে বর্ণনা করতে ব্যবহার করতে পারা যায়।

শব্দকে আরো পুরোপুরি বুঝতে হলে একটি জটিল তরঙ্গাকে, সাধারণত এর উপাদানগুলির মধ্যে বিভক্ত করা হয় যা বিভিন্ন শব্দ তরঙ্গা কম্পাঙ্কের সংমিশ্রন। নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের কোন বস্তুর কম্পনের ফলে যে শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে সুর বলে। স্বনকের কম্পন সরল দোলগতি যুক্ত হলে সুরের সৃষ্টি হয়। সুরশলাকার কম্পনে যে শব্দের সৃষ্টি হয়, তা সুর। কারণ একটি সুরশলাকা নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক কম্পিত হয়। সুরশলাকার কম্পনের ফলে একটি মাত্র কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ উৎপন্ন হয় সুতরাং একে সুর বলে।

অপরপক্ষে শব্দগুচ্ছের কম্পনের ফলে উৎপন্ন শব্দের যদি একাধিক সুর থাকে তবে শব্দটিকে স্বর বলে। অর্থাৎ স্বর কতকগুলি সুরের সমষ্টি মাত্র। স্বনকের কম্পন জটিল পর্যাবৃত্ত গতি বিশিষ্ট হলে স্বরের সৃষ্টি হয়। বেহালা বা সেতার অনেকগুলো তারের সমষ্টি নিয়ে

© Santiniketan Sahityapath

গঠিত। প্রত্যেকটি তার থেকে আলাদা আলাদা কম্পাঙ্কের সুর সৃষ্টি হয়। তাই বেহালা বাসায় তার থেকে উৎপন্ন একাধিক কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দকে একত্রে স্বর বলে। আবার বাঁশির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য তাই বাঁশি থেকেও স্বর নির্গত হয়। এইসব বাদ্যযন্ত্র থেকে উৎপন্ন শব্দগুলির প্রত্যেকটিই স্বর, কিন্তু প্রত্যেকটা স্বরের মধ্যে সুরের বৈচিত্র আছে। কোনো স্বরের মধ্যে যে সুরের কম্পাঙ্ক সবচেয়ে কম তাকে মূল সুর বলে। যদি কোনো স্বরে ৫০, ১০০, ১২০, ১৫০ প্রভৃতি কম্পাঙ্কের সুর থাকে, তবে ৫০ কম্পাঙ্কের সুরটি হবে ওই স্বরের মূলসুর। যে সুরের কম্পাঙ্ক মূল সুরের চেয়ে বেশি সেগুলিকে উপ-সুর বলে। উপরের উদাহরণটিতে সর্বনিম্ন কম্পাঙ্কের সুর (মূলসুর) হলো ৫০। এই কম্পাঙ্কের সুরটি বাদে অন্যান্য সমস্ত কম্পাঙ্কের সুরগুলি হলো ওই স্বরের উপ-সুর। অর্থাৎ কোনো স্বরের মধ্যে উপস্থিত মূলসুর বাদে অন্যান্য সমস্ত কম্পাঙ্কের সুরগুলি হলো উপ-সুর। একটি সুরের কম্পাঙ্ক অন্য একটি সুরের কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ হলে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির অষ্টক বলে। উপরের উদাহরণে ১০০ কম্পাঙ্কের সুরটি ৫০ কম্পাঙ্কের সুরের অষ্টক। কোনো স্বরে উপস্থিত উপ-সুরগুলির মধ্যে যে সুরের কম্পাঙ্ক মূল সুরের কম্পাঙ্কের সরল গুণিতক তাদের সমমেল বলে।

ধরা যাক একটি স্বর ৫০, ১০০, ১৭০, ২০০, ৩২০, ৪০০, ৫১০, ৫৫০ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট সুরের সমন্বয়ে সৃষ্টি। এর মধ্যে সবচেয়ে কম কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট (৫০) সুরটি হলো মূলসুর এবং অন্যান্য কম্পাঙ্কের সুরগুলি হলো উপ-সুর। এদের মধ্যে দেখা যায় ১০০, ২০০, ৪০০, ৫৫০ কম্পাঙ্কের সুরগুলি মূলসুর 50 কম্পাঙ্কের সুরের সরল গুণিতক। তাই এই সুরগুলি হলো সমমেল। তাহলে দেখা গেলো যে, সব সমমেলগুলি উপ-সুর কিন্তু সব উপসুর সম-মেল নয়। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, র্সা এই সুরগুলির মধ্যে সা থেকে নি পর্যন্ত সুরের কম্পাঙ্ক ক্রমশ বাড়তে থাকে। দ্বিতীয় র্সা এর কম্পাঙ্ক প্রথম সা এর কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ। কাজেই দ্বিতীয় র্সা প্রথম সা এর সমমেল (অষ্টকও বটে)।

খুব শ্রুতিমধুর শব্দের মধ্যে মূল সুর এবং তার সমমেলের সংখ্যা বেশি থাকে। সমমেলগুলি থাকার জন্য শব্দ শ্রুতিমধুর হয়। শ্রুতিকটু শব্দে মূলসুর বলে কিছু থাকে না বললেই চলে। শব্দকে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুভূতি দিয়ে বিচার করলে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১. সুরযুক্ত শব্দ এবং ২. সুরবর্জিত শব্দ। সাধারণভাবে যেসব শব্দ শুনতে ভালো লাগে তাদের সুরযুক্ত শব্দ বলে। যেমন গিটার, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ। যেসব শব্দ শ্রোতার কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হয় তাদেরকে সুরবর্জিত শব্দ বলে। যেমন বাজি পোড়ানোর শব্দ, কলকারখানা শব্দ, বাজ পড়ার শব্দ। কিন্তু এভাবে শব্দের সংজ্ঞা দিলে তা ব্যক্তি নির্ভর হবে। কারণ ঢাকের বাজনা কিছু মানুষের কাছে শ্রুতিমধুর লাগে কিছু মানুষের কাছে শ্রুতিকটু মনে হয়। আবার টিনের চালের উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ কখনো শুনতে ভালো লাগে আবার কখনো শুনতে খারাপ লাগে। নিচে সুরযুক্ত এবং সুরবর্জিত শব্দের ব্যক্তি নিরপেক্ষ সংজ্ঞা দেওয়া হলো,

সুরযুক্ত শব্দ

শব্দ উৎস বা স্বনকের নিয়মিত, পর্যাবৃত্তি, দীর্ঘস্থায়ী এবং নিরবিচ্ছিন্ন কম্পনের ফলে যেসব শব্দ সৃষ্টি হয় এবং যে শব্দ আমাদের শুনতে ভালো লাগে তাকে সুরযুক্ত শব্দ বলে। যেমন বাঁশি, সেতার, গিটার, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ সুরযুক্ত শব্দ। সেতার শিল্পী এই যখন সেতার বাজায় তখন যন্ত্রের তার নিয়মিত এক পর্যাবৃত্ত গতিতে কোনো একধারা অনুযায়ী কম্পিত হয়। এই শব্দ সুরযুক্ত বা শ্রুতিমধুর শব্দ।

সুর বর্জিত শব্দ

স্বনকের অনিয়মিত, ক্ষণস্থায়ী এবং বিচ্ছিন্ন কম্পনের ফলে যে শব্দের সৃষ্টি হয় এবং যা আমাদের কানে শ্রুতিকটু বলে মনে হয় তাকে সুরবর্জিত শব্দ বলে। স্কুল ছুটির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত চিৎকার সুরবর্জিত, কারণ ওই শব্দ ধারাবাহিকতা থাকে না এবং নিয়মিত হয় না। পটকার শব্দ, বজ্রপাতের শব্দ ক্ষণস্থায়ী সেইজন্য সুরবর্জিত।

সুরযুক্ত শব্দের বৈশিষ্ট্য

সুরযুক্ত শব্দের বৈশিষ্ট্য তিনটি। যথা ১. প্রাবল্য, ২. তীক্ষ্ণতা, ৩. গুণ বা জাতি।

 © Santiniketan Sahityapath

নিচে সুরযুক্ত শব্দের বৈশিষ্ট্য তিনটি বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

শব্দের প্রাবল্য

শব্দের প্রাবল্য বলতে শব্দ যতটা জোরে হয় তা বোঝায়। শব্দ বিস্তারের দিকে কোনো উলম্ব তলের প্রতি একক ক্ষেত্রে এক সেকেণ্ডের যে পরিমাণ শব্দ শক্তি প্রবাহিত হয় তাই হলো প্রাবল্যের পরিমাপ। শব্দের প্রাবল্য প্রধানত শব্দের তীব্রতার উপর নির্ভর করে। শব্দতরঙ্গা যত বেশি পরিমাণ শব্দ শক্তি আমাদের কানে পৌঁছে দেবে তার প্রাবল্যও তত বেশি হবে।

শব্দের তীক্ষ্ণতা

সুরযুক্ত শব্দের যে বৈশিষ্ট্যের জন্য একই প্রাবল্যের মোটা ও সরু সুরের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায় তাকে শব্দের তীক্ষ্ণতা বলে। সুরযুক্ত শব্দের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো তীক্ষ্ণতা।[৩] সুরের তীক্ষ্ণতা স্বনকের কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক; সেজন্য স্বনকের কম্পাঙ্ক যত বাড়ে তীক্ষ্ণতা যত বেশি হয়। সুর যদি মোটা হয় তাহলে কম্পাঙ্ক কম হয়, ফলে তীক্ষ্ণতা কম হবে। সুর যদি সরু হয় তাহলে কম্পাঙ্ক বেশি হয়, ফলে তীক্ষ্ণতা বেশি হবে। সুরশলাকার বাহুতে মোমের প্রলেপ দিয়ে সুরশলাকার কম্পাঙ্ক কমালে উৎপন্ন শব্দের তীক্ষ্ণতা কমে।

সুরের গুন বা জাতি

যে বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থেকে উৎপন্ন একই প্রাবল্য এবং একই তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট সুররগুলির মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায় তাকে সুরেরের গুন বা জাতি বলে। যেমন সেতার, বেহালা এবং বাশি এই তিনটি বাদ্যযন্ত্র থেকে একই প্রাবল্য এবং তীক্ষ্ণতার সঙ্গো 'সা' বাজানো হচ্ছে। এখন চোখে না দেখে শুধু শব্দগুলি শুনেই বলে দেওয়া যায় কোন শব্দটি কোন বাদ্যযন্ত্র থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। এর কারণ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থেকে উৎপন্ন শব্দের গুণ বা জাতি বিভিন্ন। সব বাদ্যযন্ত্রের উৎপন্ন শব্দের মূল সুরের সঙ্গো সর্বদা কিছু উপ-সুর মিশে থাকে। সুতরাং বাদ্যযন্ত্র থেকে স্বর নির্গত হয়।

স্বরের জাতি নির্ভর করে —

১. মূল সুরের সঙ্গো কতগুলো উপ-সুর মেশানো আছে,

২. ওই উপ-সুরগুলির কম্পাঙ্কের অনুপাত এবং

৩. ওদের আপেক্ষিক প্রাবল্যের উপর

সমান তীক্ষ্ণতা এবং প্রাবল্য বিশিষ্ট দুটি স্বরের জাতি ভিন্ন হলেও ওদের দ্বারা উৎপন্ন শব্দ তরঙ্গোর বিস্তার এবং তরঙ্গাদৈর্ঘ্য এক হবে কিন্তু ওই তরঙ্গোর প্রকৃতি ভিন্ন হয়।

শব্দের প্রাবল্য যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে: শব্দের প্রাবল্য কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা নিচে আলোচনা করা হলো —

১. স্বনকের আকারের উপর শব্দের প্রাবল্য নির্ভর করে। স্বনকের আকার বড়ো হলে উৎপন্ন শব্দ মাধ্যমে বেশি পরিমাণ শক্তি সঞ্চারিত করে। ফলে শব্দের প্রাবল্য বেড়ে যায়। এইজন্য তবলার শব্দের চেয়ে ঢাকের শব্দের জোর বেশি। আবার একটি ছোটো ঘন্টার শব্দের চেয়ে বড় ঘন্টার শব্দের জোর বেশি হয়।

২. উৎসের কম্পনের বিস্তারের উপর শব্দের প্রাবল্য নির্ভর করে। স্বনকের কম্পনের বিস্তার বেশি হলে শব্দের প্রাবল্য পারে এবং কম্পনের বিস্তার কম হলে প্রাবল্য কমে। তীব্রতা তথা প্রাবল্য স্বনকের কম্পনের বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক। যেমন সুরশলাকাকে আস্তে আঘাত করলে ক্ষীণ শব্দ শোনা যায় কিন্তু জোরে আঘাত করলে সুরশলাকার বাহুর কম্পনের বিস্তার বাড়ে এবং শব্দ জোরালো হয়।

৩. স্বনক থেকে শ্রোতার দূরত্ব: শব্দের প্রাবল্য শ্রোতাও স্বনকের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ, স্বনক থেকে শ্রোতার দূরত্ব বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হলে শব্দের প্রাবল্য কমে এক-চতুর্থাংশ হয়।

৪. মাধ্যমের ঘনত্ব: মাধ্যমের ঘনত্ব বাড়লে শব্দের প্রাবল্য বাড়ে। শীতল অবস্থায় বায়ুর ঘনত্ব বেশি থাকে, ফলে শীতের রাতে অনেক দূরের শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। আবার কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব বাতাসের ঘনত্বের চেয়ে বেশি বলে একই উৎস থেকে নিঃসৃত শব্দ বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের জোরালো হয়।
৫. মাধ্যমের গতি: মাধ্যমের গতির অভিমুখে শব্দ প্রবাহিত হলে শব্দের প্রাবল্য বাড়ে। যেমন বায়ুপ্রবাহের দিকে শব্দ প্রবাহিত হলে শব্দ জোরে শোনা যায় আবার বায়ুপ্রবাহের বিপরীত দিকে শব্দ প্রবাহিত হলে শব্দ আস্তে শোনা যায়।
৬. অনুনাদী বস্তুর উপস্থিতি: স্বনকের কাছের কোনো বস্তু বা মাধ্যমে পরবশ কম্পন সৃষ্টি হলে শব্দের প্রাবল্য বাড়ে। যদি স্বনকের কম্পন ওর কাছের কোনো বস্তুতে অনুনাদের সৃষ্টি করে তবে জোরালো শব্দ শোনা যায়। পাপা কাঠের বক্সের উপর কোনো কম্পিত সুরশলাকার হাতলকে চেপে ধরলে বাসের ভেতরের বায়ুতে পরবশ কম্পন সৃষ্টি হয়। ফলে সুরশলাকার শব্দের তীব্রতা বাড়ে। এই কারণে সেতার, গিটার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে কাঠের বাক্স ব্যবহার করা হয়।

এরপরেই যে বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রয়োজনীয়, তা হলো মানব কর্ণের গঠন। কর্ণ প্রধানত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা- বহিঃকর্ণ, মধ্য কর্ণ এবং অন্তঃকর্ণ। সংক্ষেপে এগুলির গঠন ও কাজ দেখে নেওয়া যাক।

কর্ণের গঠন ও কাজ নিচে দেয়া হলো —
১। বহিঃকর্ণ (External ear) বহিঃ কর্ণ শব্দ তরঙ্গা সংগ্রহ করে। তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা,
ক. কর্ণছত্র / পিনা (Pinna) পিনা কানের বাহিরের অংশ। ত্বক দ্বারা আচ্ছাদিত মাংসল এবং কার্টিলেজ নির্মিত।
কাজ: কর্ণকুহরে শব্দতরঙ্গা প্রেরণ করে।

খ. কর্ণকুহর (Auditory meatus) পিনা একটি নালির সঙ্গো যুক্ত থাকে। এ নালিকে কর্ণকুহর বলে। কর্ণকুহর ভেতরের দিকে কিছুটা তির্যকভাবে অবস্থান করে। ফলে কোন কঠিন বস্তু সরাসরি কর্ণপটহে আঘাত করতে পারে না।
কাজ: কর্ণকুহরের প্রাচীরে লামেম এবং মামেজাতীয় পদার্থ নিঃসরণকারী গ্রন্থি থাকার কারণে বাহিরের ধূলিকণার ক্ষতি থেকে কর্ণপটহ রক্ষা পায়। এ নালি পথে শব্দ তরঙ্গা প্রবেশ করে কর্ণপটহে কম্পন সৃষ্টি করে।

গ. কর্ণপটহ (Eardrum or Tympanic membrane) কর্ণ কুহরের শেষ প্রান্ত যাজেক টিস্যু নির্মিত একটি পর্দায় সমাপ্ত হয়। এ পর্দাকে কর্ণপটহ বা কানের পর্দা বলা হয়। কাজ: শব্দ তরঙ্গা কর্ণপটহকে স্পন্দিত করে।

২। মধ্যকর্ণ (middle ear) এটি একটি বায়ু পূর্ণ প্রকোষ্ঠ এবং নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত —
ক. কর্ণ অস্থি (Ossicle)
মধ্যকর্ণ কর্ণপটহ দ্বারা বহিঃকর্ণ থেকে পৃথক থাকে। মধ্য কর্ণে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি, একটির সঙ্গো অন্যটি সংযুক্ত হয়ে একটি চেইনের মতো অবস্থান করে। অস্থিগুলিতে হলো হাতুড়ি সদৃশ মেলিয়াস (malleus), নেহাই সদৃশ ইনকাস (incus) এবং ঘাড়োর জিনের পা দানীর ন্যায় স্টেপিস (stapes)। মেলিয়াসের একপ্রান্ত কর্ণপটহের গাত্রে এবং স্টেপিসের একপ্রান্ত অন্তঃকর্ণের ফেনেস্ট্রা ওভালিসের পর্দাগাত্রে বসানো থাকে। ইনকাস, মেলিয়াস ও স্টেপিসকে যুক্তকরণের মাধ্যমে চেইন গঠন করে।
কাজ: কর্ণপটহে সৃষ্ট শব্দতরঙ্গা অস্থিগুলির মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে অন্তঃকর্ণে পৌঁছে।

খ. ইউস্টেশিয়ান নালি (Eustachian canal)
মধ্যকর্ণ যে নালির মাধ্যমে গলবিলের সঙ্গো যুক্ত থাকে তাকে ইউস্টেশিয়ান নালি বলে। মধ্যকর্ণ এবং ইউস্টেশিয়ান নালির প্রাচীর মিউকাস পর্দার আবরণ দ্বারা আবৃত থাকার কারণে গলবিল থেকে জীবাণু মধ্যকর্ণে প্রবেশ করতে পারে এবং রাগের সৃষ্টি করতে পারে। কান পাকা নামে পরিচিত রাগেটি এভাবেই হয়ে থাকে। কাজ: ইউস্টেশিয়ান নালি দ্বারা বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণের বায়ুচাপের সমতা রক্ষা হয়। ফলে কর্ণপটহ ফেটে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়।

গ.কর্ণের ছিদ্রপথ

মধ্য কর্ণ ও অন্তঃকর্ণের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীরের গাত্রে দুটি ছিদ্র আছে। প্রত্যেকটি ছিদ্রে পর্দা থাকে। উপরের ডিম্বাকৃতি ছিদ্রকে ফেনেস্ট্রা ওভালিস (fenestra ovalis) এবং নিচের গালোকার ছিদ্রকে ফেনেস্ট্রা রাটোন্ডা (Fenestra rotunda) বলে।

কাজ: ফেনেস্ট্রা ওভালিস পেরিলিম্ফে কম্পন সৃষ্টির মাধ্যমে ককলিয়ায় প্রেরণ করে। ফেনেস্ট্রা রাটোন্ডা কম্পনরাধেক (dempener) হিসেবে কাজ করে এবং ককলিয়ায় তরল পদার্থের চলাচল হ্রাস করে।

৩। অন্তঃকর্ণ (Internal ear)

উদ্দীপনা সংগ্রহ করা অন্তঃকর্ণের প্রধান কাজ। অন্তঃকর্ণের গঠনকে মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ (membranous labyrinth) বলে এবং অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ (bony labyrinth) এর অভ্যন্তরে অবস্থান করে। দুই ল্যাবিরিন্থ এর অন্তর্বর্তী স্থান পেরিলিফ (perilymph) এবং মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ এর অভ্যন্তরে এন্ডাোলিম্ফ নামক তরল পদার্থ থাকে। শ্রবণ অঙ্গা এবং ভারসাম্যের অঙ্গা নিয়ে মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ গঠিত।

শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় কানের ভূমিকা

শ্রবণ কৌশল

শব্দ তরঙ্গা পিনা বা কর্ণছত্রে সংগৃহীত হয়ে কর্ণকুহরে প্রবেশ করে কর্ণটপটহকে আঘাত করলে তাতে কম্পনের সৃষ্টি হয়। কম্পনে মধ্যকর্ণে অবস্থিত মেলিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস অস্থি তিনটি এমনভাবে আন্দোলিত হয়, ফলে ফেনেস্ট্রা ওভালিসের পর্দা ও পরে অন্তঃকর্ণের ককলিয়ার পেরিলিম্ফে কম্পন সৃষ্টি হয়। পেরিলিম্ফে শব্দতরঙ্গের শক্তি প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পায়। পেরিলিক্ষে কম্পন সৃষ্টি হলে ককলিয়ার অর্গান অব কটির সংবেদী রোম কোষগুলি উদ্দীপ্ত হয়ে স্নায়ু উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এ উদ্দীপনা অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্রে বাহিত হলে আমরা শুনতে পাই। অতিরিক্ত শব্দ তরঙ্গা ফেনেস্ট্রা রোটান্ডার মাধ্যমে মধ্যকর্ণে ফিরে আসে এবং প্রশমিত হয়ে যায়। এছাড়াও বাক্-যন্ত্রের গঠন, ভয়েস ও হেড রেজিস্টারের মাধ্যমেও সংগীতের উপর বিজ্ঞানের ভূমিকার ছাপ পরিলক্ষিত করা যায়। মহাবিশ্বের সবকিছু ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে সুন্দর ভাষা হলো গণিত। শিল্পকলা যদি হয় প্রকৃতি এবং আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করার সবচেয়ে সৃজনশীল মাধ্যম, তবে গণিত এবং শিল্পকলাকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হতেই হবে।

সংগীতে গণিত

সংগীতে গণিতের অবদান নিয়ে কথা বলতে গেলে অবধারিত ভাবেই সবার আগে চলে আসে পিথাগোরাস এর নাম। পিথাগোরাস এর সময় গ্রিকরা সংগীতকে সৃজনশীল কোনো কিছুর থেকে বরং গাণিতিক কোনো কিছু মনে করতেই বেশি পছন্দ করতো। এবং তৎকালীন সময়ে তাদের জ্ঞান এর ধারা আবর্তিত হতো পাটিগণিত, জ্যামিতি, সংগীত এবং জ্যোতির্বিদ্যা এই চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। সংগীতকে তারা শব্দ এবং ঐকতান (harmony) এর বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করতো। শব্দের বিভিন্ন সমন্নয় বিভিন্ন ধরনের শ্রুতিমধুর কিংবা শ্রুতিকটু আওয়াজ তৈরি করে এটা অনেক আগে থেকেই জানা থাকলেও পিথাগোরাস এর গবেষণা সর্বপ্রথম এই বিষয়টির গাণিতিক ভিত্তি পরিস্কার করেন। তিনি সুরসংগতি (consonance) ও সুরঅসংগতি (dissonance) অথবা বেসুরো সুরের গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন। তিনি পিচ (pitch) এবং অকটেভ (octave) নিয়ে কাজ করেন। যেমন পিয়ানোর প্রায় মাঝামাঝি অবস্থিত C নোট ২৬২ হার্জ কম্পাঙ্কে শব্দ উৎপন্ন করে অর্থাৎ যেকোনো কিছু যদি এই কম্পাঙ্কে শব্দ তরঙ্গা তৈরী করে তবে তা C নোট এর মতো আওয়াজ দিবে। এখন কোনো নোট এর সঙ্গো যদি আরো একটি নোট মিলে ১:২ অনুপাতে একই শব্দ উৎপন্ন করে (কিন্তু ভিন্ন পিচ এ) তাহলে সেই দুটি নোট মিলে একটি অকটেভ তৈরি করবে। পাশ্চাত্যের সংগীত স্কেল (C, D, E, F, G, A, B) অনুযায়ী একই অনুপাতের কম্পাঙ্কের সকল নোটগুলিকে একই নামে ডাকা হয়। এভাবে যেসব কম্পাঙ্কের নোটগুলি মিলে একই শব্দ তৈরি করে তাদেরকে ঐক্যতানিক সুর (consonant chords) বা শ্রুতিমধুর সুর বলে। তাই যদি ১:২, ২:৩, ৩:৪, ৪:৫ অথবা C ও C, C ও G, C ও F এবং C ও E এই

© Santiniketan Sahityapath

নোটগুলি একত্রে বাজানো হয় তবে তারা ঐক্যতানিক সুর তৈরি করবে। আবার যদি C ও D একত্রে বাজানো হয় তবে তারা বেসুরো (dissonant chord) শব্দ তৈরি করবে। আরো মজার ব্যাপার হলো এই অনুপাতগুলির সঙ্গে যে শুধু কম্পাঙ্কেরই সম্পর্ক রয়েছে তা নয় বরং পিয়ানোর প্রতিটা 'কি' (key) এর সঙ্গে যে স্ট্রিং বা সুতো থাকে তার দৈর্ঘ্যের সঙ্গেও এই অনুপাত গুলোর সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণসরূপ পিয়ানোর C 'কি' এর স্ট্রিং এর দৈর্ঘ্য যতটুকু, তা পরিবর্তন করে যদি এর দৈর্ঘ্যের চার-পঞ্চমাংশে আনা হয় তবে সেই 'কি' টি E এর মতো নোট তৈরি করবে।

সোনালী অনুপাত (The Golden Ratio)

সোনালী অনুপাত নিয়ে মানুষের আগ্রহ অনেকটা সভ্যতার একেবারে গোড়ার দিক থেকেই। সর্বপ্রথম এই বিষয়টিকে লোকচক্ষুর সামনে নিয়ে আসেন পিথাগোরাস খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দিতে। অতঃপর ইউক্লিড এবং অ্যারিস্টটল এর দ্বারা এর নান্দনিক আর ঐশ্বরিক বৈশিষ্টগুলি আরো ভালোভাবে প্রকাশ পায়। সোনালী অনুপাতের মান ১.৬১৮। বারো শতকের গণিতবিদ লিওনার্দো ফিবোনাচ্চির 'ফিবোনাচ্চি ধারা' এর দ্বারা এই অনুপাতের আরো কিছু বৈশিষ্ট প্রকাশ পায় এবং প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রভাব আরো সুস্পষ্ট হয়। ফিবোনাচ্চি ধারার প্রথম দুইটি সংখ্যা হলো ১ এবং ১। এই ধারার পরবর্তী প্রতিটা সংখ্যা হলো এর আগের দুইটি সংখ্যার যোগফলের সমান। সুতরাং তাহলে ধারাটি দাঁড়ায় ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩... অন্য দিকে সোনালী অনুপাতের মান φ=(১+∞৫)/২≠ ১.৬১৮০৩৩৯৯। ফিবোনাচ্চি ধারার পরপর যে-কোনো দুইটা সংখ্যার অনুপাতের মানও হয় এই সোনালী অনুপাতের সমান। জ্যামিতিক ভাবে ব্যাখ্যা দিতে গেলে বলতে হয় একটি লাইনকে দুই ভাগে বিভক্ত (golden section) করে পুরো লাইন এর দৈর্ঘ্য ও লাইনের বড়ো অংশের দৈর্ঘ্যের অনুপাত ওই লাইনের বিভক্ত দুই অংশের অনুপাতের সমান যা হলো সোনালী অনুপাত। প্রকৃতির বিভিন্ন প্যাটার্নেও এই অনুপাতের উপস্থিতি লক্ষ যায়। বিভিন্ন জ্যামিতিক কাঠামো যেমন একটি পেন্টাগনের যে-কোনো একপাশের দৈর্ঘ্য আর এর কর্ণের অনুপাতও এই সোনালী অনুপাত। এছাড়া প্রকৃতিতে বিদ্যমান বিভিন্ন বস্তু যেমন ফুলের গঠন কিংবা শামুকের খোলস এর ভিতরেও এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আর এর ব্যবহার রয়েছে সংগীতেও। অনেক মিউজিসিয়ানরাই তাদের কম্পোজিশন এই অনুপাত আর ফিবোনাচ্চি ধারা ব্যবহার করেছেন। এর ব্যবহার রয়েছে বাদ্যযন্ত্রেও। যেমন পিয়ানোতে একটি অকটেভ এর সঙ্গে ৮টি সাদা আর ৫টি কালো নোট (মোট ১৩টি) থাকে, এর মধ্যে কালো নোটগুলি আবার ২ এবং ৩টি করে ভাগ করা থাকে। আর এই সবগুলি সংখ্যাই হলো ফিবোনাচ্চি ধারার এক একটি উপাদান। এছাড়াও আরো অনেক বাদ্যযন্ত্র যেমন ভায়োলিন বানানোর সময় এই অনুপাত বজায় রাখা হয়। তবে সংগীতের সঙ্গে গণিতের সম্পর্ক নিয়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন সম্ভবত উলফগ্যাং মোৎজার্ট (Wolfgang Amadeus Mozart)। সংগীতে তার অবদান বলাই বাহুল্য আর তিনি গণিতেরও একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। মোৎজার্ট তার বেশ কিছু কম্পোজিশনকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, প্রথম ভাগে (Exposition) মূল থিম বা ভাব এর সূচনা ঘটাতো আর পরের ভাগে (Development & Recapitulation) সেই থিমের আরো সম্প্রসারণ, গভীরকরণ আর পুনরাবৃত্তি হতো। তার কম্পোজিশন আধুনিক বিশ্লেষণ থেকে আমরা জানতে পারি যে মোৎজার্ট তার এইসব কম্পোজিশন এর এই ভাগ সোনালী অনুপাত বজায় রেখে করতেন। তবে এখানে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়, মোৎজার্ট কী এই ভাগগুলি ইচ্ছা করে করতেন নাকি শুধু শ্রুতিমধুরতার জন্য করেছেন যা অবচেতনভাবেই কিংবা কাকতালীয়ভাবে এই সোনালী অনুপাত বজায় রেখেছে তা বোঝা মুশকিল। তবে সংগীত ছাড়াও সোনালী অনুপাতের প্রয়োগ রয়েছে জ্যামিতি, স্থাপত্যশিল্পে এবং চিত্রকলায়। এর ব্যবহার রয়েছে সোনালী আয়তক্ষেত্র (golden rectangle)। সোনালী ত্রিভুজ (golden triangle), কেপলার এর ত্রিভুজ (Kepler's Triangle)। এছাড়াও গবেষকেরা এই অনুপাতের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন গ্রিক, মিসরীয়, সুমেরিয়ান, চাইনিজ, অলমেক, স্ক্যান্ডিনইভিয়ান স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মৃত্শিল্পে। এমনকি এর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে ব্রোঞ্জ যুগের কারুশিল্পেও। এ ছাড়াও তালতত্ত্বে গণিতের যে বিপুল প্রভাব দেখা যায় তা অনবদ্য। তালের বিভাগগুলি অনুযায়ী গানের বা সুরের চলন তার নিজস্ব ভঙ্গিতেই এক অনবদ্য বৈজ্ঞানিক ভঙ্গিমা। উত্তর ভারতীয় সংগীতে তালের গতিকে লয় বলা হয়।[4] মূলত তালের অন্তর্গত প্রতি দুটি মাত্রার মধ্যবর্তী সময়কেই কাল বলে। এই মাত্রাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কালের স্থিতিকালের উপর নির্ভর করে

© Santiniketan Sahityapath

লয়ের শ্রেণি-বিভাগ করা হয়েছে। ধরা যাক দুটি মাত্রার মধ্যবর্তীকাল যদি ৪ সেকেণ্ড হয় — তবে লয় বিভাজন নিম্নরূপ হবে —

৪ সেকেণ্ডে — বিলম্বিত লয়

২ সেকেণ্ডে — ঈষৎ বিলম্বিত লয়

১ সেকেণ্ডে — মধ্য লয়

১/২ সেকেণ্ডে — ঈষৎ দ্রুত লয়

১/৪সেকেণ্ডে — দ্রুত লয়

১/৮সেকেণ্ডে — অতি দ্রুত লয়।

এছাড়া কোনো নির্দিষ্ট লয়ের মধ্যে থেকেও পরিবেশনের ক্ষেত্রে লয়ের গতিকে হ্রাস-বৃদ্ধি করা সম্ভব। ধরা যাক, ১ সেকেণ্ড পরিমিত একটি লয় গ্রহণ করা হলো। অর্থৎ প্রতি ১ সেকেণ্ড পর পর একটি করে মাত্রা যাবে। এইক্ষেত্রে পরিবেশনকারী নিম্নরূপ সূত্রে অগ্রসর হবে

১ = সা

২ = রা

৩ = গা, ইত্যাদি...

কিন্তু পরিবেশনকারী যদি উক্ত মাত্রাকালের মধ্যে দুটি করে স্বর উচ্চারণ করে, তবে তা দ্বিগুণ লয়ের পরিবেশনা হিসাবে বিবেচিত হবে। আর এর রূপটি হবে নিম্নরূপ —

১ = সারা

২ = গামা

৩ = পাধা

এইরূপ লয়ের নামও ভিন্ন। যেমন :

১। লয়ের সমান সময়ে পরিবেশিত হলে তাকে বলে বরাবর লয় বলে।

২ । লয়ের সমান সময়ের মধ্যে সোয়া বার পরিবেশিত হলে তাকে কু-আড় লয় বলে।

৩ । লয়ের সমান সময়ের মধ্যে দেড় বার পরিবেশিত হলে তাকে আড় লয় বলে।

৪। লয়ের সমান সময়ের মধ্যে দুই বার পরিবেশিত হলে তাকে দ্বিগুণ লয় বলে।

৫ । লয়ের সমান সময়ের মধ্যে তিন বার পরিবেশিত হলে তাকে ত্রিগুণ লয় বলে।

৬ । লয়ের সমান সময়ের মধ্যে চার বার পরিবেশিত হলে তাকে চৌগুণ লয় বলে।

আবার কর্ণাটকী তালের ক্ষেত্রে তাল, তালাঙ্গা এবং জাতির উপর নির্ভর করে অক্ষরকালম নির্ণয় করা হয়।[৫] কর্ণাটকি তাল-পদ্ধতিতে ৭ প্রকার তাল বর্তমান। এই কারণেই কর্ণাটকি সপ্ততাল-পদ্ধতি নামে প্রচলিত। এই সপ্ততালের নাম ও অঙ্গের উদাহরণ দেওয়া হলো —

তাল		তালাঙ্গা
(১) একম্	1	(লঘু)
(২) রূপকম্	01	(দ্রুতম, লঘু)
(৩) ঝম্প তালম্	1U0	(লঘু, অনুদ্রুতম, দ্রুতম)
(৪) ত্রিপুট তালম্	100	(লঘু, দ্রুতম, দ্রুতম)
(৫) মট্যম্ তালম্	101	(লঘু, দ্রুতম, লঘু)
(৬) ধ্রুব তালম্	1011	(লঘু, দ্রুতম, লঘু, লঘু)
(৭) অট্ট তালম্	1100	(লঘু, লঘু, দ্রুতম, দ্রুতম)

© Santiniketan Sahityapath

কর্ণাটকি তাল-পদ্ধতিতে ৫ প্রকার 'জাতি' বর্তমান। এই জাতিগুলি হলো —
এ্যস্র = ৩ মাত্রা বিশিষ্ট,
চতুরস্র = ৪ মাত্রা বিশিষ্ট,
খণ্ড = ৫ মাত্রাবিশিষ্ট,
মিশ্র = ৭ মাত্রাবিশিষ্ট এবং
সংকীর্ণ = ৯ মাত্রাবিশিষ্ট।

এখানে একটি কথা যে এই জাতি পরিবর্তনে তালের মোট অক্ষর কালমের পরিবর্তন ঘটে। তবে জাতি ভেদে লঘু অঙ্গের মান পরিবর্তন হয়, কিন্তু-দ্রুতম সবসময়ই ২ এবং অনুদ্রুতম সবসময়ই-১ হবে। উদাহরণস্বরূপ ঝম্প তালমের খণ্ড জাতি এবং সংকীর্ণ জাতি অনুসারে অক্ষর কালম্ দর্শান হলো।

(ক) ঝম্পতালম্ খণ্ড জাতি
1U0
৫+১+২ = ৮ অক্ষর কালম্।
(খ) ঝম্পতালম সংকীর্ণ জাতি
1U0
৯+১+২ = ১২ অক্ষর কালম্।

কর্ণাটকি তাল-পদ্ধতির আরেকটি বিশেষ বিষয় হলো নাড়াই বা নাড়াই। নাড়াই ও ৫ প্রকার জাতির অনুরূপ। তবে নাড়াই সবসময় গুণীতক। উদাহরণ সহযোগে নাড়াই দেখানো হলো —

(ক) ত্রিপুট তালম চতুরস্র জাতি এবং ত্র্যস্র নাড়াই-
100
(৪×৩)+(২×৩)+(২×৩) = ১২+৬+৬ = ২৪ অক্ষর কালম্।
আবার,
(খ) ত্রিপুট তালম্ সংকীর্ণ জাতি এবং মিশ্র নাড়াই-
100
(৯×৭)+(২×৭)+(২×৭) = ৬৩+১৪+১৪ = ৯১ অক্ষর কালম্।
এখানে দেখা যাচ্ছে যে জাতি এবং নাড়াই ভেদে তালের অক্ষর-কালম পরিবর্তিত হচ্ছে। এটাই কর্ণাটকি তাল-পদ্ধতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

অতএব উপরোক্ত যাবতীয় আলোচনা থেকে এ কথা সহজেই অনুমেয় যে সংগীতে বিজ্ঞানের প্রভাব অনবদ্য।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। "পদার্থ বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ", ইকবাল মুহম্মদ জাফর, সময় প্রকাশন, ৩৮/২ ক, বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ১৫৪-১৫৬
২। ওই, পৃ. ১৫৯-১৬০
৩। ওই, পৃ. ১৬৩-১৬৪
৪। "সচিত্র তবলা শিক্ষা", রবীন্দ্রকুমার বসু, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ব্রাবোর্ন রোড, ক্যানিং স্ট্রিট, বড়বাজার, কলকাতা, পৃ. ৩-৪

৫। “রাগ সংগীত সাধনা, অখন্ড, (ছোট খেয়াল ও বড় খেয়াল)”, পঙ্কজ কান্তি সরকার, নওরোজ কিতাবিস্তান, পি কে রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ. ২০৫-২০৮

—

Prantik Gabeshana Patrika